RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume IX, No. 1 / April, 2024, pp. 27-45.

কর্তাভজা সম্প্রদায় ও তাদের সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান

Nepal Biswas
Assistant Professor,
Department of History,
Sreegopal Banerjee College,
Magra, Hooghly, India.
nepalbiswas81@gmail.com

Structured Abstract:

উদ্দেশ্য (Purpose): প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বংলাদেশের ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে 'কর্তাভজা ধর্মসম্প্রদায়' নামে একটি বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। নবাবী শাসনের অত্যাচারে বাংলায় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তীব্র করে তুলেছিল। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জৌলুশ আর সমাজের মধ্যে ছিল না। নানা প্রকার আচার অনুষ্ঠানের গোঁড়ামি ও ভেদ-বিভেদের আঘাতে সমাজ রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিশেষ করে দুর্দশা ভোগ করছিল দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগণ। তাদের মনে নতুন করে আশার বাণী সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়ীকতার ক্লেদমুক্ত সৌভ্রাত্র ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ নতুন মানব মাহাত্ম্যের বাণী প্রচার করেন আউলচাঁদ।

গবেষনা পদ্ধতি (Methodology): বাংলার ধর্মচর্চার ইতিহাসে কর্তাভজা নামের এই সম্প্রদায়টি যথেষ্ট পরিচিত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, গ্রন্থাদিতে এই সম্প্রদায়কে কর্তাভজা নামেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সম্প্রদায়ের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা শুধু কর্তাভজা নামটি গ্রহণ করেননি তাঁর সঙ্গে এই শব্দটির ব্যাখ্যাও সকলের সামনে উপস্থিত করেছেন। এই সম্পর্কে ভাবের গীত এর সম্পাদক মনুলাল মিশ্র এই সম্প্রদায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন সেটি হল 'কর্তাভজা ধর্মের' আদি বৃত্তান্ত বা সহজ তত্ত্ব প্রকাশ। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষে নিম্নবর্গ আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছিল South Asian Studies Group-এর মাধ্যমে। সেই সূত্রে ইতিহাসের পাশাপাশি সাহিত্যের মধ্যেও নিম্নবর্গের অবস্থান নির্ণয়ের প্রবণতা তৈরি হয়।

অনুসন্ধান (Finding): বিশ শতকের প্রথমার্ধে গ্রামশির চিন্তাসূত্র যা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছিল South Asian Studies Group-এর মাধ্যমে, সেই সূত্রে ইতিহাসের পাশাপাশি সাহিত্যের

মধ্যেও নিম্নবর্গের অবস্থান নির্ণয়ের বা নিম্নবর্গ চরিত্রের অনুসন্ধানের একটা প্রবণতা তৈরি হয়।

মৌলিকতা (Originality): বাংলা সাহিত্যের আদি উৎস বা নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, মঙ্গলকাব্য, আরাকানের কাব্য এবং পরবর্তীতে কর্তাভজা সম্প্রদায় ও তাদের সাহিত্যেনিম্নবর্গের উপস্থিতির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রবন্ধটির ধরন (Paper Type): গবেষনা পত্র।

সূচক শব্দ (Keywords): অস্পৃশ্য, নিম্নবর্গ, ধনতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্র, কর্তাভজা, গৌণধর্ম।

ভূমিকা

আন্তোনিও গ্রামশি তাঁর 'Selection from the Prison Notebooks গ্রন্থের 'History of the Subaltern Classes: Methodological Criteria' প্রবন্ধে 'Subaltern Classes' (যার বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়ে থাকে 'নিম্নবর্গ') চর্চার বিষয় পদ্ধতি প্রসঙ্গে একটা ধারণা ব্যক্ত করেছেন। আমরা জানি যে ১৯৮২ তে রণজিৎ গুহের সম্পাদনায় 'Subaltern Studies' শিরোনামে প্রথম প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় উচ্চবর্গীর ঝোঁকের বিপরীতে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসের অনুসন্ধান বা 'history from below নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চাকারীদের অন্যতম আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এর অন্যতম কারণ হিসেবে রণজিৎ গুহ'র উদ্ধৃতি আমরা তুলে ধরতে পারি-

"The historiography of Indian nationalism has for a long time been dominated by elitism. Colonialist elitism and bourgeois nationalist elitism.... share the prejudice that the making of the Indian nation and the development of the consciousness- nationalism which confirmed this process were exclusively or predominantly elite achievements. In the colonialist and neo-colonialist historigraphies these achievements are credited to British colonial rulers, administrators, policies, institutions, and culture; in the nationalist and neo-nationalist writings-to Indian elite personalities, institutions, activities and ideas." ১

আন্তোনিও গ্রামশির 'subaltern Classes' সম্পর্কিত ধারণাকেই নিম্নবর্গীয় ইতিহাসের অনুসন্ধানের প্রধান চিন্তনভূমি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। 'Subaltern Classes' কথাটির সাধারণ অর্থ যথাক্রমে - প্রথমত ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার অধস্তন

কর্মচারীকে বোঝায়। দ্বিতীয়ত ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে যারা প্রান্তিক এবং শোষক শ্রেণি দ্বারা নিষ্পেষিত শ্রেণির মানুষ তারাই 'Subaltern Classes' বা নিম্নবর্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক শ্রেণি, জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ, ভাষা এবং সংস্কৃতির নিরিখে যারা সমাজে অধস্তন বা আধিপত্যের অধীনত তারাই নিম্নবর্গ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চাকারী / ইতিহাসবিদদের মতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় উচ্চবর্গীয় ঐতিহাসিকেরাই উচ্চবর্গের ইতিহাস রচনা / পরিকল্পনাকে প্রাধানা দিতে গিয়ে উচ্চবর্গের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিরিখে নিম্নবর্গকে বিচার / মূল্যায়ন করেছেন। যার জন্য নিম্নবর্গের ইতিহাস বা নিম্নবর্গের স্বাতন্ত্র্য উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিকোণে প্রাধান্য পায় নি। কায়িক-শ্রমে নিযুক্ত, সামাজিক ভাবে অনগ্রসর, ক্ষমতা শূন্য, অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত এবং আর্থিক দিক থেকে নিম্ন শ্রেণির কৃষক, শ্রমিক ও অন্ত্যজ প্রান্তিকেরাই নিম্নবর্গের অন্তর্ভূক্ত। নারীরাও সামাজিক বৈষম্যের নিরিখে বা পুরুষতন্ত্রের অধীনে নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যদিও নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্তিকরণ বা নিম্নবর্গের সৃষ্টি এক অর্থে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কারণ শ্রেণি-অবস্থান, সময়ের নিরিখে নিম্নবর্গীয় চরিত্রের রূপান্তরের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং অর্থনৈতিক- সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতার স্বরূপ ও লক্ষণের উপর নিম্নবর্গীয় চরিত্র বিচার পদ্ধতিটি নির্ভর করে। আন্তোনিও গ্রামশি নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার জন্য যে ছয়টি স্তরের উল্লেখ করেছেন, সেই সূত্রেই অধস্তন শ্রেণির জীবনচর্যা, ক্রিয়াকলাপ, লড়াই-আন্দোলন, মননশীলতা, দৃষ্টিভঙ্গির বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে একটা খোলা পরিসর গ্রামশির লেখার ধরণের মধ্যেই রয়েছে। সে কারণেই নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চাকারীরা নিম্নবর্গীয় ইতিহাস ও নিম্নবর্গকে নানা ভাবে নানা আঙ্গিকে বিচারের কথা বলেছেন। নিম্নবর্গের সংঘবদ্ধতা ও শ্রেণিগত উত্তরণ প্রসঙ্গে গ্রামশি বলেছেন-

"The subaltern classes, by definition, are not unified and can not unite until they are able to become a "State". ২

শ্রমিক শ্রেণির একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রসঙ্গে মার্ক্স বা এঙ্গেল্সের চিন্তানুসারে প্রোলেতারিয়েত হিসেবে শ্রমিক ও কৃষকের অগ্রণি ভূমিকার কথার সঙ্গে গ্রামশি আরও একটি প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তা হল সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ের নাগরিক সমাজের বিশেষ ভূমিকা। আসলে যেখানে উন্নত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে রয়েছে শক্তিশালী নাগরিক সমাজ এই নাগরিক সমাজই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আগলে রাখে। আর নাগরিক সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিবাদি শ্রেণি। সুতরাং নিম্নবর্গের কাজ হওয়া উচিত নাগরিক সমাজের মধ্যে

নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা। কারণ মার্ক্সবাদী চিন্তায় রাষ্ট্র দমনমূলক অনুশাসন যন্ত্র। গ্রামশির চিন্তায় রাষ্ট্র শুধু দমনমূলক অনুশাসন যন্ত্র নয় বরং পুঁজিবাদী শ্রেণি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে 'আধিপত্যে'র মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করেছে। সুতরাং নিম্নবর্গের লক্ষ্য হল 'পুরসামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে করায়ত্ত করে জনগণের মনন ও চিন্তার স্তরে পুঁজিবাদের বিকল্প আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রধান রক্ষাবলয়কে দখল করা।" ৩ পুর সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বলতে শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা আসলে জনগণের চেতনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে সেই ক্ষেত্রগুলিকে বোঝানো হয়েছে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে গ্রামশির চিন্তাসূত্র যা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছিল South Asian Studies Group-এর মাধ্যমে, সেই সূত্রে ইতিহাসের পাশাপাশি সাহিত্যের মধ্যেও নিম্নবর্গের অবস্থান নির্ণয়ের বা নিম্নবর্গ চরিত্রের অনুসন্ধানের একটা প্রবণতা তৈরি হয়। বাংলা সাহিত্যের আদি উৎস বা নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, মঙ্গলকাব্য, আরাকানের কাব্য এবং পরবর্তীতে কর্তাভজা সম্প্রদায় ও তাদের সাহিত্যেনিম্নবর্গের উপস্থিতির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বংলাদেশের ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে ‘কর্তাভজা ধর্মসম্প্রদায়' নামে একটি বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। নবাবী শাসনের অত্যাচারে বাংলায় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তীব্র করে তুলেছিল। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জৌলুশ আর সমাজের মধ্যে ছিল না। নানা প্রকার আচার অনুষ্ঠানের গোঁড়ামি ও ভেদ-বিভেদের আঘাতে সমাজ রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিশেষ করে দুর্দশা ভোগ করছিল দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগণ। তাদের মনে নতুন করে আশার বাণী সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়ীকতার ক্লেদমুক্ত সৌভ্রাত্র ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ নতুন মানব মাহাত্ম্যের বাণী প্রচার করেন আউলচাঁদ। কর্তাভজা ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে অক্ষয় কুমার দত্ত বলেছেন:

"কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের অনুরূপ অথবা উহার শাখা স্বরূপ আর একটি সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার নাম কর্তাভজা। যদিও ঘোষপাড়া নিবাসী সদগোপ কুলোদ্ভব রামশরণ পাল এই ধর্মের প্রচার করেন, কিন্তু এক উদাসীন ইহার প্রবর্তক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।" ৪

একইভাবে এই লোকধর্ম সম্পর্কে উইলসন সাহেবও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা স্বীকার করেছেন যে:

"ব্রাহ্মণ প্রভাবিত দেশে সদগোপ জাতীয় চাষী রামশরণ পালকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া হিন্দু মুসলমান সকল জাতীয় লোকের শিষ্যত্ব গ্রহণ ব্যাপারটির মধ্যে জাতিভেদ প্রথার বিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল। সকলেই সমান এই ধারণাটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্যে এখনও দোলমেলা উপলক্ষ্যে সমবেত কর্তাভজাগণ এক পঙক্তিতে আহার করাকে প্রধান তীর্থকৃত বলিয়া মনে করেন।" ৫

কবি নবীন চন্দ্র সেন কর্তাভজা লোকধর্ম সম্পর্কে বলেছেন যে:

"এখন যে ধর্মমত সমূহের সামঞ্জস্য বলিয়া একটা কথা শুনেছি, দেখা যাইতেছে, এই রামশরণ পালই সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সকল ধর্মের মূল এক এবং এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে অধঃপতিত দেশে তিনি তাহা প্রথম প্রচার করিলেন।" ৬

'নদীয়া কাহিনী' গ্রন্থের লেখক কুমুদনাথ মল্লিক কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে নিম্নোক্ত মত পোষণ করেছেন:

“তবে এ দলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সংখ্যাধিক্য। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা তিনগুণ অধিক এবং সেই কারণেই বোধ হয় ইহাদের মধ্যে ব্যভিচারের স্রোত এত প্রবল। একদিন যে ধর্মের মূল মন্ত্র ছিল 'মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্তাভজা', এখন সেই উচ্চ আদর্শ কিরূপ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ৭

কর্তাভজা লোকধর্মের উদ্ভব প্রসঙ্গে অধ্যাপক মানস মজুমদার 'কর্তাভজা সম্প্রদায় দুটি শতাব্দীর মূল্যায়ন' প্রবন্ধে বলেছেন:

"কর্তভজা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়বাদীরা যাঁর ভজন করেন তাঁকে কর্তারূপে অভিহিত করেন, তাই এঁদের নাম, কর্তাভজা। মূলগুরুই এদের কাছে 'কর্তা' বা ঈশ্বর। মানব দেহধারী গুরুর মধ্যেই এঁরা ঈশ্বরকে পেতে চেয়েছেন।" ৮

বাংলার ধর্মচর্চার ইতিহাসে কর্তাভজা নামের এই সম্প্রদায়টি যথেষ্ট পরিচিত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, গ্রন্থাদিতে এই সম্প্রদায়কে কর্তাভজা নামেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সম্প্রদায়ের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা শুধু কর্তাভজা নামটি গ্রহণ করেননি তাঁর সঙ্গে এই শব্দটির ব্যাখ্যাও

সকলের সামনে উপস্থিত করেছেন। এই সম্পর্কে ভাবের গীত এর সম্পাদক মনুলাল মিশ্র এই সম্প্রদায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন সেটি হল 'কর্তাভজা ধর্মের' আদি বৃত্তান্ত বা সহজ তত্ত্ব প্রকাশ। মনুলাল মিশ্র কর্তাভজা শব্দের 'সত্য ধর্ম' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। তিনি আবার 'কর্তাভজন' শব্দের সঙ্গে সহজতত্ত্ব শব্দও প্রয়োগ করেছেন। মনুলাল মিশ্র বলেছেন:

"সহজ ধর্ম কি ? সত্যধর্ম। সত্যধর্ম কাহাকে বলে ? যাহাতে দ্বৈতজ্ঞান নাহি, অর্থাৎ সকলেই এক কৃপাময় পরম পুরুষের ভক্ত ও আজ্ঞাবহ সেবক-অথচ কোন ধর্মেই বিদ্বেষভাব জন্মায় না বা তাহা মিথ্যা এ ধারণাও করিয়া দেয় না তাহাই সত্য ধর্ম।" ৯

কর্তাভজা সম্প্রদায় বহির্ভূত বিভিন্ন ব্যক্তিদের রচনায় কর্তাভজা নামটি অধিক প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। যেমন 'সংবাদ প্রভাকর', 'সোম প্রকাশ', 'বান্ধব', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় এবং অক্ষয় কুমার দত্ত, দাশরথি রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রমুখের আলোচনায় এবং ইউরোপীয় মিশনারীদের ও অন্যান্য বিদেশীদের বর্ণনায় এই সম্প্রদায়কে কর্তাভজা সম্প্রদায় নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

মধ্যযুগীয় বাংলার উপাসক সম্প্রদায় এবং সাধন পদ্ধতির যে সমস্ত ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় দুটির মধ্যে যে সমন্বয় সম্ভব হয়েছে সেখানে সত্য শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন:

“অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মসাধনায় ও ধর্মানুষ্ঠানে যেখানে হিন্দু মত নিরপেক্ষ উদার সমন্বয়ের প্রকাশ হয়েছে, সেখানেই 'সত্য' কথাটি একটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। সুফী সাধকরা আল্লাহকে যখন পার্সোন্যাল ঈশ্বর বলে ভাবতেন তখন তাঁকে নাম দিতেন 'হক', সত্য। এই হক এরই প্রতিধুনি পাই সত্যপির-সত্যনারায়ণে আর সত্য মহাপ্রভূতে। কর্তাভজারা সত্যের উপর খুব ঝোঁক দিয়েছেন। তাঁদের এ সত্য নীতিকথার ব্যবহারিক সত্য মিথ্যার সত্য নয়। এ সত্য দেশ কালাতিশায়ী অদ্বয় অটল সত্ত্বা, সৎ।" ১০

প্রচলিত ধারণা অনুসারে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার নদীয়া জেলার চাকদহ খানার (বর্তমানে কল্যাণী থানা) কল্যাণীর ঘোষপাড়া গ্রামে আউলচাঁদ নামে এক উদাসীন ফকির 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। J.H.E.Garrett, Bengal District Gezetteers, Nadia গ্রন্থে বলেছেন:

"Tha kartabha a sect was founded about the middle of the Eighteenth century and took its origin at tha village of Ghoshpara, in the chakdaha thana. ১১

H.H.Risley, The Tribes and Castes of Bengal গ্রন্থে বলেছেন:

"Kartabha a, ab obscure sect believed to have been founded early in the Eighteenth Century by one Aul chand, who was considered by his followers to be an incarnation of Chaitanya. " ১২

তাহলে আমরা বলতে পারি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চাকদহ থানার অধীনে বেলপাড়া গ্রামে শ্রীচৈতন্যের অবতার হিসাবে আউলচাঁদ 'কর্তাভজা' নামে একটি গৌণধর্ম প্রক্ষাদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শিষ্য রামশরণ পাল ছিলেন এই ধর্মের প্রচারক। আউলচাঁদ সম্পর্কে অজস্র জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তাঁর সম্প্রদায়ী লোকেরা তাকে দপুরে অবতার বলে মনে করতো। নদীয়া জেলার উলা গ্রামে মহাদেব নামে এক বারুই ছিলেন। আউলচাঁদ ১৬৬৪ সালের ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবারে উলাগ্রামের মহাদেব বাইয়ের পানের বরজে এক অষ্টমবর্ষীয় বালক রূপে দর্শন দেন। মহাদেবের কোন সন্তানাদি না থাকায় তিনি মায়াবশে এই অজ্ঞাতকুলশীল বালকটিকে নিয়ে নিজ ঘরে এনে লালন করতে থাকেন। এই বালকের নাম রাখা হয় পূর্ণচন্দ্র। তিনি প্রায় ২২ বছর বয়সে অণ্ডবদাতা মহাদেব বারুই-এর বাড়ি থেকে ছদ্মবেশে পালিয়ে আবার অন্য এক জমিদার বাড়িতে কিছুকাল থেকে পরিশেষে পূর্ববাংলা বর্তমান বাংলাদেশে এবং অন্যান্য বহুস্থানে এমন করেন ও ২৭ বৎসর বয়সে 'বেহারা' গ্রামে উপনীত হন। এর কিছু সময় পরেই তিনি কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় এসে উপস্থিত হন। হটু ঘোষ ছিলেন তাঁর প্রথম শিষ্য। পরে এক এক করে সর্বসমেত ২২ জন তাঁর প্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে বর্ণিত আউলচাঁদের ২২ জন শিষ্য হলেন- (১) হটু ঘোষ, (২) বেচু ঘোষ, (৩) রামশরণ পাল, (৪) নয়ন, (৫) লক্ষ্মীকান্ত, (৬) নিতাই ঘোষ, (৭) আনন্দরাম, (৮) মনোহর দাস, (৯) বিষ্ণু দাস (১০) কিনু দাস, (১১) নিত্যানন্দ দাস, (১২) খেলারাম উদাসীন (১৩) কৃষ্ণদাস, (১৪) হরিঘোষ, (১৫) কানাই ঘোষ (১৬) শংকর, (১৭) শ্যাম কাঁসাবি, (১৮) ভীমরায় রাজপুত, (১৯) পাচু রুইদাস। (২০) নিধিরাম ঘোষ, (২১) শিশুরাম (২২) গোবিন্দ।

এই বাইশ ফকিরের নামমালা একটি সুন্দর ছড়ার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে:

"শুনে সবে ভক্তিভাবে নামমালা কথা।

বাইশ ফকিরের নাম ছন্দেতে গাঁথা।।

জগদীশপুরবাসী বেচুঘোষ নাম।

শিশুরাম কানাই নিতাই নিতাই নিধিরাম।।

ছোট ভীমরায় বড় রামনাথ দাস।

দেদোকৃষ্ণ গোদাকৃষ্ণ মনোহর দাস।।

খেলারাম ভোলানাড়া কিনু ব্রহ্মহরি।

আন্দিরাম নিত্যানন্দ বিশু পাঁচকড়ি।।

হটু ঘোষ গোবিন্দ নয়ান লক্ষ্মীকান্ত।

ইহারাই ভক্তিপ্রেমে অতিশয় শান্ত।।

পূর্বের অনুসঙ্গী এই বাইশজন।

এরাই করিল আসি হাটের পত্তন।।" ১৩

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অজস্র গল্প চালু আছে। আউলচাঁদ ঘোষপাড়ায় অবস্থানকালে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে গ্রামের অজস্র মানুষকে হতবাক করে দিয়েছেন। এই অলৌকিক ঘটনা প্রসঙ্গে নিতাই ঘোষ তাঁর 'কল্যাণীর সেকাল ও একাল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

"আউলচাঁদ ঘোষপাড়া গ্রামে অবস্থানকালে তাঁর সেই অবিশ্বাস্য অলৌকিক ক্ষমতাবলে কঠিন রোগগ্রস্থ বহু মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিরাময় করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অন্ধ ও খোঁড়া মানুষকে হিমসাগরের পুকুরের জলে স্নান করিয়ে অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্ব দূর করে দিয়েছিলেন।" ১৪

সেই বিশ্বাসে এখনও বহু দর্শনার্থী প্রত্যেক বছর দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে ঘোষপাড়ার সতীমায়ের মেলায় এসে হিমসাগরে স্নান করেন কঠিন রোগব্যাধি দূর ও মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য।

কর্তাভজাদের সাহিত্যে 'ভাবের গীতে' আউলাস সম্পর্কে বলা হয়েছে

"আউলচাঁদ দোয়া গরু

সঙ্গে বাইশ ফকির বাছর তার

এ ভাবের মানুষ কোথা থেকে এলো

এর নাইকো বোষ সদাই তোষ

মুখে বলে সত্য বলো।

এর সঙ্গে বাইশ জন

সবার একটি মন

বাহু তুলে করে প্রেমে চ্লাচল।

এ যে হারা দেওয়ায় মরা বাঁচায়

এর হুকুমে গঙ্গা শুকলো।" ১৫

ভক্ত কবি দীনবন্ধু মিত্রের কণ্ঠে গাওয়া আর একটি গান

"বাইশ ফকিরের মাঝে, ও কে কাঙাল বিরাজে

কাঙালে করিতে দয়া, কাঙাল সাজ সাজ।

সোনার বরণ কলেবর, রূপে গুণে মনোহর

কোটি কোটি শশধর, রূপ হেরিয়ে মরে লজে।

ভক্ত বৎসল দয়াময়, এমন কি আর কেহ হয়

ভক্তে যদি বেদনা পায়, সে বেদনা তাঁর বাজে।।

জীবনের প্রতি হয়ে সদয়, এসেছে ঘোষ পাড়ার মাঝে।" ১৬

এখানে বাইশ ফকিরের মাঝে আউলচাঁদের অবস্থানের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা যুবই চমকপ্রদ। তিনি দীন দরিদ্রের সেবা করতে নিজেকে কাঙাল রূপে চিত্রিত করেছেন। সমাজে অবহেলিত, জাতকূল-মান-গৌরবহীন অশিক্ষিত মানুষকে কাছে টেনে নিতে তার বিকল্প ছিল না। যেহেতু তিনি কোন জাতের বিচার করতেন না, তাই অল্পদিনের মধ্যে

জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। সোনার বরণ চেহারায় বহুগুণে গুণান্বিত, জীবের প্রতি করুণা, জীব উদ্ধারিতে ঘোষপাড়াতে তাঁর আগমন। উদার মানবতাবাদী বাস্তব বোধ সম্পন্ন আউলচাঁদ ভক্ত সমাজে বিভিন্ন নামে সমাদৃত। যেমন আউল মহাপ্রভু, ফকির ঠাকুর, ঠাকুর বাবা, সিদ্ধপুরুষ, কর্তাবাবা, পাগলা ফকির, আউলে ব্রহ্মচারী, আউলে গোঁসাই, সাঁই গোসাই ও কাঙালী মহাপ্রভু নামে পরিচিত। আউলচাঁদ প্রবর্তিত কর্তাভজা ধর্মে বিশ্বাসী মাত্রই মানেন, 'সব ধর্ম সত্য, সব আচার সত্য এবং সব মানুষই বিশ্বকর্তা, মালিকের সন্তান।' এই মতাবলম্বীরা আরো বিশ্বাস করেন--'কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র, আউলচন্দ্র একই ব্যক্তি'। এই ফকিরকে কর্তাভজারা গৌরাঙ্গের অবতার হিসাবে গ্রহণ করেন। তাই তাদের মধ্যে প্রচলিত শ্লোকটি হল:

"কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র, আউলচন্দ্র

তিনেই এক একেই তিন।"

এইভাবে আউলচাঁদের খ্যাতি ও বিস্তার ঘটে। বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় ১৭৬৯ সালে ঘোষপাড়া থেকে আউলচাঁদ যশোহর জেলার অন্তর্গত বোয়ালিয়া গ্রামে অসুস্থ শিষ্য নফরচন্দ্রকে দেখতে যান। এটিই তাঁর ঘোষপাড়া থেকে অন্তিম যাত্রা। যাওয়ার পূর্বে রামশরণ পালকে তার প্রধান শিষ্যরূপে মনোনীত করে যান। ১৭৭০ সালে আউলচাঁদ দেহরক্ষা করেন।

আউল চাঁদের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে যে সকল স্থানের বিবরণ পাওয়া গেছে প্রতিটি স্থানেই তাঁর স্মৃতি বিজাড়িত বহু নিদর্শন আজও রয়েছে। আউলচাঁদ ও তৎপরবর্তী কর্তা বা সম্প্রদায় প্রধানদের স্মরণে বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। যেমন ঘোষপাড়ায় দোল উৎসব, রথযাত্রা এবং আউলচাঁদ ও তৎপরবর্তী রামশরণ পালের বংশধ্বরদের স্মরণোৎসব। কাঁচড়াপাড়ায় কানাই ঘোষের বসত বাড়িতে সারা বৎসর বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। যেমন বৈশাখী পূর্ণিমাতিথি পালন, আষাঢ় মাসে ফল ছোড়া অনুষ্ঠান এবং মহালয়া তিথিটিকে বিশেষভাবে পালন করা হয়ে থাকে।

আউলচাঁদ মানুষ ছিলেন। অতএব মানুষই সত্য। সুতরাং মানুষ গুরুই পরমপদার্থ। মানুষ শব্দ উচ্চারণ মনন বা শ্রবণ করলে এদের যে কত ভাবের উদয় হয়, তা অন্যের অনুযাবন করা কঠিন। এদের মধ্যে এইরূপ ধারণা যে আউলচাদের জীবাত্মা রামশরণ পলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তিনি কর্তাস্বরূপ হয়েছিলেন আউলচাদের ২২ জন শিষ্যের মধ্যে একমাত্র

রামশরণ পাল ছাড়া অন্য কোন শিষ্যের নাম বা খ্যাতি তত বেশি নেই। এদের মধ্যে দুই একজন শিষ্যের বংশধরদের নদীয়ায় এখানে সেখানে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে এক রামশরণ পালের বংশধরেরাই কেবল কর্তাভজা বলে খ্যাত।

রামশরণ পাল সম্পর্কে বহুল প্রচলিত একটি ছড়া:

"একদিকে শঙ্কর ঘরে হল নবশিশু।

পুষ্পবৃষ্টি ইত্যাদিতে হয় ধন্য বসু।।

অতীব সুন্দর শিশু অতি মনোহর।

সরল সহজভাবে মাধুর্য আকর।।

পিতা পালিতেন তারে অতি সমতলে।

আর চার পুত্র তার ঈর্ষাভাবে মনে।।

এইরূপে দিনে দিনে বাড়িতে থাকেন।

শ্রী রামশরণ নামে ক্রমে অভিহিত হন।।"

এই ভাষ্য থেকে জানা যায় জগদীশপুর গ্রামে শঙ্করপাল নামে এক গৃহস্থ বাস করতেন। দান, ধ্যানে যিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত। তারই পঞ্চম পুত্রের নাম রামশরণ পাল। ভাইদের ঈর্ষা ও ক্রোধ হেতু তিনি নিজের আলয় ত্যাগ করে ঘোষপাড়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। সেখানে আউলচাঁদের প্রধান শিষ্যে পরিণত হন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ সরল প্রকৃতির মানুষ। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি জগদীশপুরের সন্নিকটে গোবিন্দপুর নিবাসী গোবিন্দ ঘোষের কন্যা সরস্বতী দেবীকে বিবাহ করেন। এই সরস্বতী দেবীই পরবর্তীকালে সতীমা নামে খ্যাতি লাভ করেন। রামশরণ পালের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র দুলালচাঁদ নাবালক (৭বছর) হওয়ায় সরস্বতী দেবী সতীমা নাম ধারণ করে শক্তহাতে কর্তাভজার

দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সতীমার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে ভক্তদের বিশ্বাস আজও ছড়ার আকারে গীত হয়ে থাকে। যেমন:

"সতীমার উপরে যে বা রাখিবে বিশ্বাস।

সেরে যাবে কুষ্ঠ ব্যাধি হাঁপ শূল কাশ।।

কৃপা হলে ভবে তাঁর ঘটে অঘটন।

অন্ধ পায় দৃষ্টি শক্তি বধিরে শ্রবণ।।

চিত্ত যেবা রাখে পায় বিত্ত পায় ভরে।

বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী তাহার প্রভাবে।।

সতীমার ভোগ দিতে হবে যার মতি।

সকল বিপদে সেই পাবে অব্যাহতি।।"

তাঁর উত্তর পুরুষেরা আজও ঐ ভক্তি শ্রদ্ধার অংশীদার। অগণিত নিরক্ষর অর্ধশিক্ষিত সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় থেকে আগত তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষের কাছে আজও তাঁরা প্রাণের ঠাকুর হিসাবে পরিচিত। তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ যে এই সম্প্রদায়ে একেবারে অনুপস্থিত একথা বলা যাবে না। সাহিত্যিক গজেন্দ্র কুমার মিত্র তাঁর 'কান পেতে রই' গ্রন্থে লিখেছেন যে, বাবা আউলচাঁদ স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু আর তাঁর প্রধান সেবক রামশরণ পালের স্ত্রী সরস্বতী দেবী সাক্ষাৎ শচী মা-সতী মা-কর্তা মা।

শ্রী অদ্বৈতচন্দ্র দাস 'ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায়' গ্রন্থে বলেছেন:

"দেখলাম এই মানুষেতে,

মানুষ মিশিয়েছে।

বৃন্দাবনে বাকি ছিল

ঘোষপাড়াতে পূর্ণ হল।

জীবের দশা মলিন দেখে

কর্তা মা প্রেমের বস্তা খুলেছে।।" ১৭

কর্তাভজা সম্প্রদায়ভূক্ত ভক্ত সাধারণের নিকট সতীমা পরম পূজনীয়। তিনি পরমা প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি জগৎ মাতা। তিনি সর্বদাই দীনহীনভাবে নিপীড়িত মানুষের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। তিনি নিজে ধর্ম পরায়ণ, সত্যনিষ্ট ভক্তিমতি ছিলেন। আর্তনিপীড়িত মানুষের প্রতি তার ছিল গভীর ভালোবাসা। ভক্তদের মধ্যে বহুল প্রচারিত সতীমায়ের কৃপায় অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পায়। খঞ্জপায় চলার শক্তি, বোবা কথা বলে। তারই কৃপায় বন্ধ্যানারী সন্তান লাভ করে।

দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করে অসংখ্য নরনারী। সতীমার অলৌকিক মহিমা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে বহু সাধক মনীষী ও ভক্তবৃন্দ নিত্যধাম ঘোষপাড়াতে এসেছেন, যার গতিধারা আজও প্রবাহমান।

রামশরণের স্ত্রী সতীমার গর্ভে রামদুলাল বা দুলালচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। রামদুলালের নেতৃত্বে কর্তাভজা সম্প্রদায় বিশেষ উন্নতিসাধন করেছিল। রামদুলাল বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সময়ে ঘোষপাড়ার মেলায় বহু মনীষীদের আগমন ঘটত। এই প্রসঙ্গে নিতাই ঘোষ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ১৮০২ সালে কেরী ও মার্শম্যান দুলালচাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। শুধু তাই নয় তাঁর সময়ে রাজা রামমোহন রায় ঘোষপাড়ায় এসেছিলেন। ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল দুলালচাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রামদুলালের ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত সতীমা এই ধর্মের প্রধান রূপে বিবেচিত হন। রামদুলাল এই সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে দায়িত্ব নেওয়ার পরও সতীমার প্রভাব ছিল ব্যাপক। ১৮৩৩ সালে রামদুলাল বা দুলালচাঁদের মৃত্যু হয়। সন্তানের মৃত্যুর পর সতীমা পুনরায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে কাজ করেন। ১৮৪০ সালে সতীমা ঘোষপাড়াতে দেহরক্ষা করেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে বাড়িতেই সমাধিস্থ করা হয়। এর পর কর্তাভজাদের গুরুবংশের কী হল? তাঁরা অবশ্যই পেলেন এক সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, এক বিশাল ভক্তমন্ডলী এবং সম্প্রদায়িক স্বীকৃতি। রামদুলালের মৃত্যুর পর কর্তা হন ঈশ্বরচন্দ্র। অবশ্য কনিষ্ঠ ভাই ইন্দ্রনারায়ণও কর্তা বলে অভিহিত হন। ঈশ্বরচন্দ্র ঠাকুর বংশের শেষ যোগ্য প্রতিনিধি। শত্যশিব পাল বর্তমানে ট্রাস্টি ও দেবমহান্তনামে ঘোষপাড়া পাঠ পরিচালনা করছেন। প্রধানত এর উদ্যোগে এবং সতীমাতা সেবক সংঘের সহায়তায় এখন দোলের সময় উৎসব পরিচালিত হয়। বহুজন সমাগমে কলরবমুখর, ভক্তসমাগম, নবদীক্ষাদান, ভাবের গীত গান, সম্প্রদায়ীদের ধর্মসভা সবই আকর্ষণীয়। হিমসাগর ও ডালিমতলায় ব্যাধিগ্রস্ত এবং বিশ্বাসীদের ভিড়ে দুপ্রবেশ্য।

কর্তাভজার মূল তত্ব এই মানুষ আর সত্য। তাদের সাধনগীতে বলা হয়েছে;

"ভেদ নাই মানুষে মানুষে

খেদ কেন ভাই এদেশে

তাদের দীক্ষামন্ত্র জয়গুরু সত্য

কর্তা আউলে মহাপ্রভু

জয় জয় সত্য।" ১৮

কর্তাভজা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান আকর গ্রন্থ হল দুলালচাঁদ রচিত 'ভাবের গীত'। ভাবের গীত নাম কেন হল, সে সম্পর্কে লালশশী বলেছেন:

"যে নিধি ভাবের স্বরূপ,

ভাবের বন্ধু, ভাবের সিন্ধু, সদানন্দ সুধাময়,

ত্রিকুলে তারে সকলে বলে রসময়,

দেখ রসিক নগরে, রসের সাগর, রসের সাগর যেই,

চিন্তা করি, চিনতে পারি চিন্তামণি সেই।"

সত্যশিব পাল দেব মহান্ত তাঁর গ্রন্থে 'ভাবের গীতে' কর্তাভজা ধর্ম সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন:

"আছে কর্তাভজা; এক মজা, সত্য উপাসনা,

বেদ বিধিতে নাইকো তার ঠিকানা,

এসব চতুরের কারখানা।

ছয়ং কর্তা এসে মুন্নুকে করলে বীজ রোপণ,

কার বা সাধ্য লয় করে থাকেন আমার এই কর্তারই ভজন।

আমি আপ্ত খোদে মেয়ে মরদে কর্তা ভজাব

কর্তাভজার কাছে তোদিকে মূর্খ বানাব।

এরা করবে মজা পেয়ে রাস্তা সোজা

কি মজা স্বর্গ পাতালপুরে।" ১৯

লোকধর্মগুলির মধ্যে কর্তাভজা সম্প্রদায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত। আগে মেলা বসত অর্থ বর্গমাইলব্যাপী জমিতে। রোজ ৫০-৭০ হাজার ভক্ত সমাগম হত। আগে ঘোষপাড়ার মেলা বসত ৬০০ বিঘা আম লিচুর জমির উপর। ৩৫০০টি গাছ ছিল। প্রতিটি গাছের তলায় একাধিক মহাশয়ের আসন থাকত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মেলার জনি অধিগৃহিত হয় রাজশক্তির হাতে। পরে ভারত সরকারের সামরিক বিভাগ মেলার জন্য জমি ছেড়ে দেন কিন্তু

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাত্র ৩০ একর জমি মেলার জন্য সংরক্ষিত রাখেন। জবরদখলকারীরা ওই ৩০ একরেও ভাগ বসিয়েছে এবং বেশীরভাগ গাছ কেটে নিয়েছে। এ ব্যাপারে বর্তমান সময়ে কর্তা, মহাশয় ও বরাতিরা সমান অসহায়।

দেবমহান্তদের দেওয়া তথ্যে জানাযায় পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতে কর্তাভজা আছে, তবে উত্তরবঙ্গে খুবই কম। বেশি আছে কলকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়ায়। বাংলাদেশের যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর ও রাজশাহীতে সম্প্রদায়ীরা আছে। বাংলার বাইরে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, ও ওড়িশার অনেক প্রবাসী বঙালি কর্তাভজা আসনের অধিকারী।

কর্তাভজাদের সম্পর্কে নৈষ্ঠিকসমাজের সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ নারীসাধনের প্রসঙ্গে। সামাজিক ভাবে সেকালে এটি নিতান্তই সত্য ঘটনা যে, অনেক অসহায় স্ত্রীলোক

কর্তাভজাদের একজাতীয় দালাল শ্রেণীর হাতের পুতল হয়ে গিয়েছিল। তাই রামলাল শর্মা তাঁর 'পাষন্ড দলন' গ্রন্থে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে কর্তাভজাদের উদ্দেশে লিখেছেন:

"সাধু কি করিয়া থাকে প্রকৃতির সঙ্গ।

সাধু কি ধরিতে চায় কলুষ ভুজঙ্গ।।

সাধু কি কপট ফাঁদ বিস্তৃত করিয়া।

রাঁর ভাঁড় আতুরান্ধে খায় ভুলাইয়া।।" ২০

ব্রাহ্মণ হয়েও যারা শূদ্র সংসর্গে কর্তাভজা ধর্ম পালন করত ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আঘাত তাদের উপরও প্রবল হয়েছে। উনিশ শতকের প্রখ্যাত পাঁচালীকার দাশরথি রায় তাঁর 'কর্তাভজা' নামে যে পাঁচালী লেখেন তাঁর প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিতে তখনকার বিরোধ ব্যঙ্গের ছবি আছে। যেমন:

"নূতন হয়েছে কর্তাভজা শুনো কিঞ্চিত তার মজা

সকল হতে শ্রবনে বড় মিষ্ট।।

পরে না কপ্নি বহির্বেশ নয় বৈরাগী নয় দরবেশ

নয় কোন ভেকধারী।

ওরা পুরাণ মানে কি কোরাণ মানে

তার কিছু বুঝতে নারী।।

বিধবার নাই একাদশী বিশেষ শুক্রুবারের নিশি

হয় ভোজন যার যে ইচ্ছামত।" ২১

তখন ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজের পক্ষে কর্তাভজাদের উত্থান এতদূর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে তাদের নিয়ে কলকাতার প্রখ্যাত 'জেলেপাড়ার সং' বেরোয়। এখানে কর্তাভজা- বিরোধীদের বক্তব্য জানা যাবে। লেখাটি নাট্যকারের সংলাপের ঢঙে লেখা। পাত্রপাত্রী মহাশয়, কর্তামা ও ব্রাহ্মণ বরাতি।

মহাশয়ের উক্তি:

আমি মশাই এ দলের চাঁই সবাই মশাই বলে তাই।

ছাড়ে দেবতাগুরু আপন জরু ও যার মন্ত্র ঝুঁকি কানে।।

কলু তেলি বামুন মালী বদ্যি বা কায়েত হাড়ি চন্ডাল সমেত।

আমার গুণের জোরে এক আসরে সবাই জমায়েত।।

কর্তামায়ের উক্তি:

বড্ড শুচি জাতে মুচি আমি কর্তা মা।

আমার হ'লে দয়া যার বীজা

সেও ছেলের শোনে রা।।

পরে শাড়ি কড়ে রাড়ী

যদি কারো পেটটি উঁচু হয়।

আমার চরণ করলে শরণ

ও তার নেইকো কিছু ভয়।

ওই ঘোষপাড়ায় ডালিমতলায়

এই আঁচলে আছে আমার মাটি।

রাখলে ঘরে (সতী) মায়ের বরে (আসে)

পায় ভাতার পরিপাটি।।

আধবয়সী বর্ষিয়সী ও যার কর্তা বাইরে যায়

মিছে টাকা উড়ে তায়।

মাটির গুণে কথা শুনে

গিন্নির লুটিয়ে পড়ে যায়।

ব্রাহ্মণ বরাতির উক্তি -

শুনি কর্তার মুখে কর্তাভজা মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা

হৃদমজা লুটতে ছিল আশা।

আমি নৈকষ্য কুলীনের ছেলে মোহিনীর রীতিতে ভুলে

কর্তামায়ের ঘরে নিয়েছি বাসা।।

ধর্মে নাই ভেদাভেদ জাতের বিচার

হাড়িমুচি সব একাকার

ঘোর কলিতে পুরুষোত্তমের মত।

সবাই অন্ন পায়স করে

ডালে ঝোলে কাটি মারে

একসঙ্গে অন্ন খেতে রত।।" ২২

এ সব উদাহরণে ধরা আছে উনিশ শতকের বাংলার এক বিশেষ সমাজচিত্র ও চরিত্র। এই চিত্র আর বাঙালিচরিত্র আমাদের বোঝায় যে, কর্তাভজা ধর্ম এদেশের সামাজিক কর্ণভিত্তিক ভারসাম্য তুলেধরেছিল এক অপ্রতিরোধ্য ঘূর্ণন। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আউলচাদের শিষ্যদের প্রথম চারজন যথাক্রমে সৎগোপ, কলু, গোয়ালা এবং মুচি।

ভারতবর্ষে ধর্ম-সাধনার ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করি তবে আমরা দেখতে পাই যে, ধর্মের সঙ্গে সঙ্গীত ও সাহিত্যের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বেদ, উপনিষদ, শৈক- শাক্ত, কোরাণ, বৌদ্ধ, জৈন সাহিত্য মূলত ধর্মীয় গ্রন্থ। বিভিন্ন সময়ের বাঙলা সাহিত্য প্রধানত ধর্মকে অবলম্বন

করে রচিত হয়েছে। আমরা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলিতে যে সঙ্গীতের প্রকাশ পাই, তা নির্দিষ্ট ভাবে কোন ধর্মীয় মতকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। তেমনভাবে কর্তাভজাদের এই সঙ্গীতগুলিও ধর্মীয় চিন্তধারার বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে। সেই দিক থেকে আমরা বলতে পারি, সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র (References)

Guha Ranajit, On Some Aspects of the Historiography of Colonial India, Canberra, Subaltern Studies, August 1981, Page 1

Gramsci Antonia, Selection from the Prison Notebooks (Edited and Translated by Quintin Hoare Geoffrey Nowell-Smith), Delhi, Aakar Books, 2015, Pg. 52

বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মল সম্পাদনা, গ্রামশি চর্চা, কলকাতা, কৃষ্টি, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ.২৯।

দত্ত অক্ষয়কুমার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩২৪, পৃ-২২০

Wilson H.H., Sketch of the religious sects of the Hindus, P.72.

সেন নবীনচন্দ্র, আমার জীবন, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ-১৭

মল্লিক কুমুদনাথ, নদীয়া কাহিনী, পুস্তক বিপণী, পৃ-১৯০

মজুমদার মানস, কর্তাভজা সম্প্রদায়: দুটি শতাব্দীর মূল্যায়ন, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ-৩৭

মিশ্র মনুলাল, কর্তাভজন ধর্ম্মের আদি বৃত্তান্ত বা সহজতত্ত্ব প্রকাশ, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ- মুখবন্ধ

সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, কলকাতা, পৃ-১৫৩

Garrett J.H.E, Bengal District Gazetteers, Nadia, Basumati Corporation limited, kolkata, p-63

Risley H.H., The Tribes and Castes of Bengal; Firma KLM Private limited, Calcutta 1891 (reprint), p.347

দত্ত অক্ষয়কুমার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, পাঠভবন, কলকাতা, পৃ-১২০-২১

মিশ্র মনুলাল, কর্তাভজা ধর্মের আদি বৃত্তান্ত বা সহজতত্ত্ব প্রকাশ; ইন্দ্রভূষণ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ-২০

তদেব, পৃ-২৭

তদেব, পৃ-২৯

দাস শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র দাস, ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায়, প্রকাশক:শ্রীমতি রুমা দাস, কলকাতা, পৃ- ৩৭

তালিব আবু, লালন পরিচিতি, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ-১-২

পাল দেব মহান্ত সত্যশিব, ঘোষপাড়ার সতীমা ও কর্তাভজা ধর্ম, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ-১৯

চক্রবর্তী সুধীর, রচনা সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, বর্ণপরিচয়, কলকাতা, ২০১০, পৃ-৩৭

তদেব, পৃ-৩৮

তদেব, পৃ-৩৯